

নন-এমপিও শিক্ষক : একুশ শতকের শ্রমদাস!

শিক্ষাঙ্গন

আমিরুল আলম খান

এমপিওহীন (মাসুলি পে-অর্ডার) শিক্ষকদের দীর্ঘ আন্দোলন ফলপ্রসূ হয়নি। কিছুদিন বিরতি দিয়ে অনশনের মতো কর্মসূচি পালন করতে হলো তাদের; হোক না প্রতীকী। তাতেও সমাধানের আশ্বাস পর্যন্ত মেলেনি! এটা ভাবা সত্যিই কঠিন যে কিছু মানুষের অবিস্মৃতিয়োগ্য দেশের লক্ষাধিক শিক্ষক দাসের চেয়েও নিকৃষ্ট জীবন যাপনে বাধ্য হচ্ছেন। কিন্তু দেশের শিক্ষার চাকা সচল রাখতে এই নন-এমপিও শিক্ষকদের ভূমিকা ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। বিনা পয়সায় তারা শ্রম দিচ্ছেন বছরের পর বছর, কেউ কেউ প্রায় ২০ বছর ধরে। শ্রমের ন্যূনতম স্বীকৃতিটুকু পর্যন্ত না পেয়েও তারা শ্রম দিচ্ছেন শুধু এই আশায় যে একদিন তাদের কাজের স্বীকৃতি মিলবে।

এই শিক্ষকদের প্রতি কর্তৃদেব যেন কোনো দায় নেই, সহানুভূতি নেই, তাদের কথা ভাবার মতো 'ফালতু সময়'ও তাঁদের নেই! তারা অনেক বেশি জরুরি কাজে ব্যস্ত! বরং তারা বুক ফুলিয়ে বলতে পারেন, এই নন-এমপিও শিক্ষকেরা প্রায় এক মাস রাজধানী ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে, সরকারের হৃৎপিণ্ডের টিল ছোড়া দুরন্তে, শহীদ মিনারে অবস্থান ধর্মঘট করেছেন, রাস্তায় যান চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছেন, তারপরও সরকার তাঁদের ওপর দয়র্ঘ আচরণ করেছে; আগের মতো গুলি ছোড়েনি, কাদানে গ্যাসে চোখের পানি ঝরায়নি, লাঠিপেটা করেনি, তাঁদের সেখান থেকে জোর করে উঠিয়ে দেয়নি, নিদেনপক্ষে গরম পানি ঢালেনি, লন্ডাওড়া ছুড়ে চোখের পানি-নাকের পানি এক করেনি! অন্তত সরকারের এই 'সহনশীল' আচরণকে দুর্বলতা না ভেবে তাঁদের উচিত এই 'শ্রদ্ধাবাহক সরকার'কে বাহবা দেওয়া, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা।

তারা সত্যিই কৃতজ্ঞ। স্থানীয় নেতাদের কথায় তাঁরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন, বছরের পর বছর বিনা প্রতিবাদে, না খেয়ে, পরিজনদের অভুক্ত রেখে শিক্ষার চাকা সচল রেখেছেন। তারা বিদ্রোহ করেননি, বরং সরকারের সব নির্দেশ পালন করেছেন, করছেন। সরকারকেও সে কথা মনে রাখতে হবে।

আমাদের শিক্ষা বিভাগ সত্যিই অসাধারণ! তাদের বানানো আইনে ফাঁকের কিনারা নেই। যেমন, কত দুরন্তে, কত জনসংখ্যার জন্য কতটুকু জমি, কেমন অবকাঠামো, লাইব্রেরি, ল্যাব, কমিউনাল রুম থাকতে হবে, কত টাকা ব্যাংকে জমা থাকবে, কোন কোন যোগ্যতার কত শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মচারী, কত শিক্ষার্থী থাকলে কোনো ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যাবে, তার সুনির্দিষ্ট বিধান আছে। সেসব বিধির আলোকে নিম্ন ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং উচ্চমাধ্যমিক কলেজের স্বীকৃতি দেওয়ার কথা দেশের শিক্ষা বোর্ডগুলোর। শর্ত পূরণ না হলে বোর্ড সেই প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি দিতে পারে না, দেয়ও না। কিন্তু অন্তত দুই-আড়াই দশকে শর্ত পূরণ না করেও শত শত নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও উচ্চমাধ্যমিক কলেজ স্থাপিত হয়েছে। আর সেগুলো স্বীকৃতি পেয়েছে সরাসরি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে। সে নির্দেশ অদ্ভুত। শর্ত পূরণে ব্যর্থ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষা বোর্ডের কাছ থেকে স্বীকৃতি পেতে ব্যর্থ হয়ে ক্ষমতাবানদের মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আবেদন করলে মন্ত্রণালয় সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডকে একটি সরেজমিন প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আদেশ জারি করে থাকে। বোর্ড সে মোতাবেক অপূর্ণ শর্তসমূহ উল্লেখ করে রিপোর্ট পাঠায়। সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী শিক্ষা মন্ত্রণালয় সেসব অপূর্ণ শর্ত 'শিথিল করতে সম্মত' হয়ে ওই সব শর্ত পূরণ ছাড়াই প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতির বিষয় বিবেচনা করতে চিঠি দেয় বোর্ডকে। বোর্ডের তখন সে প্রতিষ্ঠান স্বীকৃতি না দিয়ে উপায় থাকে না।

কলেজে স্নাতক (পাস ও অনার্স) ও স্নাতকোত্তর পর্বের দায়িত্ব জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দাপাগিরি মানে না। উচ্চমাধ্যমিক কলেজই পরে ডিগ্রি কলেজে রূপান্তরিত হয়। ডিগ্রি কলেজে উন্নীত করতে কলেজ কর্তৃপক্ষকে আগেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি নিতে হয়। সভাব্যতা না থাকলে তারা সে অনুমতি দেয় না। ডিগ্রি কোর্সের জন্য পদ-কাঠামো অনুযায়ী বাড়তি শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগদান বাধ্যতামূলক। অনার্স কোর্সের জন্য আরও বাড়তি শিক্ষক প্রয়োজন হয়। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা পদ-কাঠামোয় বেসরকারি কলেজে অনার্স

অন্তত দুই-আড়াই দশকে শর্ত পূরণ না করেও শত শত নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও উচ্চমাধ্যমিক কলেজ স্থাপিত হয়েছে। আর সেগুলো স্বীকৃতি পেয়েছে সরাসরি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে। সে নির্দেশ অদ্ভুত

কোর্সের জন্য এই বাড়তি শিক্ষক নিয়োগের সুযোগ নেই। সরকারি কলেজের পদ-কাঠামোয় সে বিন্যাস আছে। প্রতিটি কলেজকে সে পদ-কাঠামো অনুযায়ী পদ সৃষ্টি করে নিতে হয়, বলা বাহুল্য অনেক কাঠখড় পুড়িয়েই। সরকারি কলেজে প্রচলিত পাস ও অনার্স কোর্সে বিষয়ভিত্তিক পদ-কাঠামো মেনে নির্দিষ্টসংখ্যক শিক্ষক না থাকলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বেসরকারি কলেজে পাস বা অনার্স কোর্সের অনুমতি দেয় না।

এমপিওভুক্ত নিম্নমাধ্যমিক থেকে মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং উচ্চমাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি কলেজে রূপান্তরিত হলেও সরকারের পদ-কাঠামো অনুযায়ী যে নতুন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ পান তাদের জন্য সরকারের কাছ থেকে বেতন-ভাতা পেতে এমপিওভুক্ত হতে হয়। ২০০৫ সালের পর ২০১০ সালে মাত্র একবার প্রায় ১৬০০ কুল, কলেজ, মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতার জন্য এমপিও দেওয়া হয়েছে; তারপর বারবার শুধু আশ্বাসই পেয়েছেন হতাশাগ্রস্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা। পাস কোর্সের জন্য এমপিও পাওয়ার আইনগত বাধা না থাকলেও যেসব বেসরকারি কলেজে অনার্স চালু হয়েছে, সেসব কলেজে অনার্স কোর্সের এই 'বাড়তি' শিক্ষক মন্ত্রণালয়ের স্বীকৃত পদ-কাঠামোর বাইরে। তাই মন্ত্রণালয়ের বিবেচনায়, তাদের এমপিও পাওয়ার কোনো সুযোগই নেই।

সরকারি নীতিবহির্ভূত (?) বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে যাদের তাঁরাই হলেন হতাশাগ্রস্ত নন-এমপিও শিক্ষক-কর্মচারী! তাঁদের সংখ্যা, সরকারি হিসাবেই অন্তত সোয়া লাখ! এ নিয়োগে 'রাজনৈতিক বিবেচনা' আর 'লাখ লাখ টাকা ভোদনশনের' অভিযোগ অফুরান।

সাধারণভাবে গড়ে এ দেশে একজন মানুষের চাকরিজীবন বছর ত্রিশেক। যৌবনেই প্রাণী সর্বাপেক্ষা সুজনশীল। জীবনের স্বর্ণপ্রসূকালের দুই-তৃতীয়াংশই এসব নন-এমপিও শিক্ষক-কর্মচারীর রইল নিষ্ফল। এই দুনিয়ায় তাঁদের বেঁচে থাকার কী-ই বা অর্থ হয়? কে তার দায় নেবে? যে যুবক ২০ বছর বিনা পয়সায় শ্রম দিচ্ছেন তাঁর যৌবনের হারানো ২০টি বছর কে ফিরিয়ে দেবে? এসব প্রশ্ন তড়িত করে না এই অন্ধ সমাজকে!

এই সোয়া লাখ নন-এমপিও শিক্ষক, যারা আধুনিক শ্রমদাস ছাড়া আর কিছুই নন, তারা তো এ দেশের অপরাধনীতিরই পার্শ্বফল। ভোটের বাস্তবের কথা ভেবেই এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, ভোটের কথা ভেবেই তাঁদের নিয়োগদান। তাঁদের দায়ভার সরকার অস্বীকার করবে কীভাবে? দাসের শ্রম নিতে মালিক অন্তত তাঁকে বাঁচিয়ে রাখার মতো কিছু খাবার, আবরক ঢাকতে কিছু ছেঁড়া কাপড়চোপড়, অসুখে ওষুধ-খাওয়ার-বাঁচিয়ে রাখতে। কিন্তু নন-এমপিও শিক্ষকেরা এসব কিছুই পান না! উটেটা কয়েক লাখ টাকা দিয়ে এই মজুরিহীন দাসত্ব কিনেছেন তাঁরা। কেউন বেইলস গবেষণা করে দেখিয়েছেন, একজন আধুনিক ক্রীতদাসের বর্তমান বাজারমূল্য মাত্র ৯০ ডলার। তিনি বাংলাদেশের একজন নন-এমপিও শিক্ষকের বাজারমূল্য কত বলবেন?

ইসলাম বলছে, 'শ্রমিকের ঘাম শুকানোর আগেই তাঁর মজুরি পরিশোধ কর'। আমাদের সর্গবিধানেও শ্রমের মজুরি প্রদানের গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে। তাই কাউকে গতর খাটিয়ে মজুরি না দেওয়া শুধু অনৈতিক নয়, অপরাধও। এই যে সোয়া লাখ নন-এমপিও শিক্ষক, যাদের শ্রম-রক্ত আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে, তাঁদের শ্রমের মূল্য পরিশোধের দায় কি আমাদের সবার ওপর বর্তায় না?

● আমিরুল আলম খান: শিক্ষাবিদ।
amirul Khan7@gmail.com